বিদায় নিলো যবে

সুব্রত রায়

- দিদিভাই কেমন আছিস?
- ভালো। তুই? তোর বউ বাচ্চারা?
- সবই ভালো। ওরা এখন দিল্লিতে। সমরদা কাল চলে গেল?
- হ্যাঁ। সমর কাল সন্ধ্যায় রওনা দিলো। দুবাই হয়ে আমেরিকা যাবে।
- তোদের এ-কদিন বেশ কাটলো তাই না?
- বহুদিন পর ছুটি নিলাম আর ছুটিটা দারুণ উপভোগ করলাম।
- সমরদার সঙ্গে এতদিন পরে তোর কি করে যোগাযোগ হলো?
- আমাদের সঙ্গে পড়তো ছন্দা। যার ভাই অভীক তোর এক ক্লাস নীচে যাদবপুরে পড়তো, মনে আছে? ছন্দা আর তার বর প্রদোষ শিকাগো গিয়েছিলো। প্রদোষের একটা কনফারেন্স ছিলো। হঠাৎ একটা মলের দরজায় ওদের সমরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।
- সমরদা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান তাই না?
- হ্যাঁ। প্রদোষের কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর কয়েকদিন শিকাগো বেড়াবার পরিকল্পনা ছিল। সমর প্রায় জোর করে ওদের হোটেল থেকে বাড়িতে তুলে নিয়ে এলো।
- তারপর?
- সমরের বাড়িটা খুব সুন্দর। একা থাকলেও বাড়িটা খুব গোছানো। একটা দুর্দান্ত গেস্ট রুম। তার সঙ্গে আলাদা বসবার ঘর ও সঙ্গে একটা ছোট প্যান্ট্রি। বসবার ঘরে টিভি, রেফ্রিজেরেটার, কম্পুটার, ইন্টারনেট, ফোন আর প্যান্ট্রিতে মাইক্রোওয়েভ, হিটার আছে। গেস্ট না থাকলে সমর নিজেই নিজের গেস্ট হয়ে মাঝেমাঝে সুইটটাতে থাকে। প্রদোষ আমাদের চেয়ে এক বছরের সিনিয়র, ফিজিক্স পড়তো। প্রদোষ চন্দ্র মিত্র তাই সমর ওকে ফেলুদা বলে ডাকতো। সেই দেখাদেখি আমরাও ফেলুদা বলতাম। সমর ছন্দার কাছ থেকে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের খবর নিলো। এর কিছুদিন পর আমি বিদেশি ডাকটিকিট দেওয়া একটা চিঠি পেলাম। খুলে দেখি সমরের চিঠি। কেমন আছো ভালো আছি মামুলি চিঠি। কিছু না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দিলাম। সপ্তাহ তিনেক পর এক শনিবার রাত্তির সাড়ে দশটার সময় ফোন পেলাম। তারপর ফোন আর ই-মেলে যোগাযোগ শুরু হলো।
- কলকাতায় সমরদার তো কেউ নেই। শুনেছিলাম ওরা মা বাবা মারা যাবার পর কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে।
- সমরের ভাই বম্বেতে চাকরি করে। সমর অনেকদিন আগে ওর বাবা মারা যাবার পর কলকাতায় এসেছিল। তারপর দু-একবার এদেশে এসেছে। কিন্তু কলকাতায় আসেনি। একদিন কথায় কথায় বললো পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি। সেখানে ভালো হোটেলে থেকেছি। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে হোটেলে থাকতে মন চায় না। তাই কলকাতায় যাই না। আমি বললাম

আমার বাড়িতে এসে থাকতে পারো। সমর হালকা ভাবে বললো বেশ তাহলে যাবো। অক্টোবর মাসে ফোন করে বললো পয়লা ডিসেম্বর কলকাতায় আসছে আর একত্রিশে ফিরে যাবে।

- তুই বোধহয় ভাবিসনি সমরদা কথাটা সিরিয়াসলি বলেছিল।

- ঠিক তাই। যাইহোক বাড়িটা অনেকদিন রঙ করা হয়নি আর টুকটাক অনেক কাজ ছিল। ইয়াকুবকে ডেকে পাঠালাম। প্লাম্বিং আর ইলেকট্রিকেরও কিছু কাজ ছিলো। ইয়াকুব তিন সপ্তাহে বাড়িটা একদম নতুনের মতো করে দিলো। সকালে বাড়ির চাবি ইয়াকুবকে দিয়ে কলেজে চলে যেতাম আর সন্ধ্যার সময় ইয়াকুবের কাছ থেকে চাবি নিয়ে নিতাম। সব কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ইয়াকুব বললো দিদি পর্দাগুলো পালটে ফেলুন। আমার চাচা পর্দার কাজ করে। আপনি শুধু কাপড় পছন্দ করে দিন বাকিটা আমি করে দেবো।

- দিদিভাই সমরদার সঙ্গে তোর এতদিন একদম যোগাযোগ ছিলো না?

- নারে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার পর বার দুই দেখা হয়েছিলো।

- তোদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাই না?

- তা ছিল। বি এ তে আমি ফার্স্ট। কিন্তু এম এ তে আমার চেয়ে সতেরো নম্বর বেশি পেয়ে সমর ফার্স্ট হলো। একটা মজার ঘটনা বলি। পরীক্ষার পর আমরা কয়েকজন কফি হাউসে মাঝেমাঝে আড্ডা দিতে যেতাম। এ রকম একদিন কফি হাউস থেকে বেরিয়ে সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সত্যবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের দেওয়ালে পুরোনো বই দেখছিলেন। আমাদের দেখে বললেন কি খবর? কে যেন জিজ্ঞাসা করলো স্যার আমাদের খাতা কেমন দেখলেন? সত্যবাবু বললেন সকলেই বেশ ভালো লিখেছে তবে সমরের খাতাটা সত্যই অসাধারণ। বিভাস ফস্ করে বললো স্যার সমরের খাতাটা চিনলেন কি করে? খাতায় তো নাম থাকে না। সত্যবাবু হাত দিয়ে চশমাটা পিছনে ঠেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন সুন্দরবনে কি করে বাঘ গোনা হয় জানো? সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে সমরের খাতার কি সম্পর্ক বুঝতে না পেরে আমরা বোকার মতো এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

- সত্যি, বাঘের সংখ্যার সঙ্গে খাতার কি সম্পর্ক আমিও বুঝতে পারছি না।

- আরে শোন না। সত্যবাবু বললেন তোমাদের কি মনে হয় বাঘদের বলা হয় তোমরা লাইন করে দাড়াও আমরা এক দুই করে গুনবো? বাঘদের গোনা হয় ওদের থাবার ছাপ গুনে। তোমরা বার্ণলির গল্পটা বোধহয় জানো না। তখনকার দিনে মাঝেমাঝে একজন বড় বিজ্ঞানী একটা সমস্যা বাজারে ছেড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করতেন কে এটা করতে পারে। বার্ণলির এইরকম একটা চ্যালেঞ্জ নিউটনের চোখে পড়লো। নিউটন তখন ট্যাঁকশালের কর্তা। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছেন। একদিন ট্যাঁকশাল থেকে ছুটি নিয়ে সমস্যার সমাধান করে নিজের নাম না দিয়ে বার্ণলির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বার্ণলি তখন একটা কথা বলেছিলেন, সিংহের থাবা দেখলেই সিংহটাকে চেনা যায়। সমরের খাতা পড়লেই সমরকে চেনা যায়। রোল নাম্বার দরকার হয় না।

- কতো পেয়েছিলো সমরদা ঐ পেপারটা তে?

- সেটাই তো বলছি। সত্যবাবু এমনিতে ঢেলে নম্বর দেন বলে বাজারে নাম আছে। আমি বুঝলাম আমার হয়ে গেলো। ঐ পেপারে আমি খুব বেশি হলে আশি পাবো। আর সত্যবাবুর

কথায় মনে হলো সমর নব্বইয়ের ঘরে পাবে। হলোও তাই। আমি পেলাম বিরাশি আর সমর পেলো তিরানব্বই। আসলে প্রতিভার সঙ্গে পরিশ্রম দিয়ে লড়াই করা যায় না।

- তারপর?

- রেজাল্ট বের হবার ক-মাসের মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেলো। ক্লাসের সবার নেমন্তন্ন ছিলো। বিয়ের দিন সমরের সঙ্গে দেখা হলো। তখন একটা কলেজে পার্ট টাইম পড়ায়। কয়েকদিন পর আমেরিকা চলে গেলো পি এইচ ডি করতে। তারপর আর দেখা হয়নি। আমি ছ-মাসও ঐ বাড়িতে টিঁকতে পারলাম না। একদিন এক কাপড়ে বের হয়ে বাবার কাছে চলে এলাম। বাবা সব শুনলেন। পরদিন সকালে বাবা ওকে ফোন করে বললেন হয় মিউচুয়ালে রাজি হও আর নাহলে আমি তোমার নামে এফ আই আর করবো। বলা বাহুল্য ও প্রথমটায় রাজি হয়ে গেলো।

- আমি তখন মাদ্রাজে চাকরি করি। বাবা আমাকে কিছু জানাননি। আসলে বাবা আমার মতামতটা তেমন পাত্তা দিতেন না। অবশ্য মতামত দেবার কি বা ছিলো?

- মিউচুয়াল হলে কি হবে? আদালত একটা অদ্ভুত জায়গা। সবকিছু মিটতে দু-বছরের বেশি সময় লেগে গেলো। আদালত যেদিন আমায় মুক্তি দিল সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। বাড়ি ফিরে বড়ো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠলাম। চোখের তলায় কালি। বয়স অনেকটা বেড়ে গেছে। দুদিন ধরে ভাবলাম। বুঝলাম নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। শনিবার সত্যবাবুকে ফোন করলাম। বললাম দেখা করতে চাই। উনি বললেন তোমার কথা সব শুনেছি। তুমি সোমবার সাড়ে দশটার সময় আমার ঘরে এসো আর সঙ্গে তোমার স্কুল থেকে এম এ পর্যন্ত মার্কশীটের জেরক্স কপি এনো।

- সত্যবাবু খবর পেলেন কি করে?

- সেটা আমি জানিনা। আর আমি কখনোও জিজ্ঞাসা করিনি। যথাসময়ে সত্যবাবুর ঘরে গেলাম। উনি মার্কশীটগুলো দেখলেন। একবার আমার দিকে তাকালেন। মার্কশীটগুলোর উপর অ্যাটেস্টেড লিখে, সই করে নিজেই ছাপ্পা লাগিয়ে দিলেন। ড্রয়ার থেকে হাতে লেখা একটা চিঠি বার করলেন। মার্কশীটগুলো চিঠির সঙ্গে স্টেপেল করে একটা বড় খামে পুরে মুখ বন্ধ করে বললেন, ডি পি আই উজ্জ্বল আমার ছাত্র। তুমি এই চিঠিটা নিয়ে এক্ষুণি ডি পি আই অফিসে চলে যাও। তোমার কাছে টাকা আছে? নাহলে আমি দিচ্ছি ট্যাক্সি করে যাও।

- তারপর? কি রে চুপ করে গেলি কেন?

- গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিলো, এক চুমুক জল খেয়ে নিলাম। ডি পি আই উজ্জ্বল আচার্য্য আমার হাত থেকে খামটা নিয়ে খুললেন। সত্যবাবুর চিঠিটা পড়লেন। মার্কশীটগুলো দেখলেন। ফোন তুলে বললেন গার্গী, স্যার একটি মেয়েকে পাঠিয়েছেন। ক্যারিয়ার খুব ভালো। তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। আজ বিকেলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বের হয়ে যাবে। আমার ছ-মাস টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার ক্ষমতা আছে। পরে পি এস সি করে নেওয়া যাবে। সমস্ত কাগজগুলো জেরক্স করলেন। একটা কাগজে কি সব লিখলেন। সব কাগজ আর একটা খামে বন্ধ করে বললেন গার্গী আমার সহপাঠী। ব্রেবোর্ণের প্রিন্সিপাল। তুমি ওর কাছে চলে যাও।

- এ তো একেবারে সিনেমার গল্পের মতো।

- এলাম পার্কসার্কাসে। গার্গী ঘোষ খামটা খুললেন। বেয়ারাকে বললেন স্বাতীদিকে ডেকে আনো। স্বাতীদি এলেন। প্রিন্সিপাল বললেন স্বাতীদি, তোমার কাজের অসুবিধা হচ্ছিলো তাই উজ্জ্বলকে বলেছিলাম। এই মেয়েটিকে স্যার পাঠিয়েছেন। এই কাগজগুলো দেখো আর ওর ক্লাস ঠিক করে দাও। আর আমাকে বললেন কাজ হয়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

- স্যারের ক্ষমতা তাহলে সাংঘাতিক। এক কলমের খোঁচায় তোর চাকরি হয়ে গেলো।

- সেদিন দেখলাম স্যার একজনই আছেন। কেউ সত্যবাবু বা এস এস বলছে না। কি পড়াতে হবে বুঝে নিয়ে আবার প্রিন্সিপালের কাছে গেলাম। গার্গীদি বললেন স্যার তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি গিয়ে দেখা করো। আবার স্যারের ঘরে ট্যাক্সি করে গেলাম। স্যার বললেন এই বইগুলো তুমি নিয়ে যাও। এখন এইসব টেক্সটবুকগুলো কলেজে চলে। শ্রীপদদাকে ডেকে বললেন, বইগুলো নিয়ে দিদিমণিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। আমাকে বললেন তুমি নিজের মতো করে তৈরি করো, যেনো ছ-মাসের মধ্যে পাস ও অনার্সের যে কোনো বিষয় চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে পড়াতে পারো।

- ওরে বাবা। সে তো ভীষণ শক্ত।

- তেমন কিছু নয়। একসময় আমাকে এসব ভালো করে পড়তে হয়েছিলো। আর তুই ভুলে যাচ্ছিস তোর দিদিভাই বি এ তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আর ঈশান স্কলার। নিজের বই খাতা ধুলো ঝেড়ে বার করলাম। এর ক-দিন পর জোর ধাক্কা খেলাম। বাবা কাউকে চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ চলে গেলেন।

- সে সময়ের কথা আমার মনে আছে।

- মাস ছয়েক পর স্যার ডেকে পাঠালেন। এর মধ্যে গার্গীদি একদিন মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন স্যার খোঁজ রাখছেন আমি কেমন পড়াচ্ছি। স্যারের ঘরে গিয়ে দেখলাম একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন। স্যার বললেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস বদল হলো। সামনের বছর জুলাই থেকে এই সিলেবাস চালু হবে। এই হলো তার কপি। তুমি ফার্স্ট পেপারের একটা বই লিখে ফেলো। সময় ছ-মাস। আমি বইটা দেখে ভূমিকা লিখে দেবো। অনিলবাবু আপনি ওর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে ফেলবেন। অনিলবাবু কি একটা বলতে গেলেন। স্যার সেটা আন্দাজ করে তাকে না বলতে দিয়ে বললেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এই বইয়ের ভালো কাট্‌তি হবে। আমাকে একটা ফাইল দিয়ে বললেন এর মধ্যে গত দশ বছরের কোয়েশ্চেন আছে। বই লেখার সময় এগুলো মাথায় রেখো।

- শুনেছি তোর বই খুব বাজারে চলে।

- শোন না। আমি একটা চ্যাপ্টার লিখি আর স্যারকে দিয়ে আসি। স্যার দেখে দেন। এমনি করে চলতে লাগলো। ছ-মাসের জায়গায় সাত মাসে বই শেষ হলো। স্যার বললেন এবার সেকেন্ড পেপারের একটা বই লেখো। এই বইটা বেশ তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললাম। ঠিক পাঁচ মাসে।

- তুই বইটা ইংরাজিতে না লিখে বাংলায় লিখলি কেন?

- কারণটা খুব সোজা। বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে পাস-পেপার বাংলাতে পড়ে।

- প্রকাশকের কাছ থেকে পয়সা পেলি? শুনেছি ওরা ভীষণ ঠকায়।
- এক শনিবার সকালে স্যারের ফোন পেলাম। আমার ছাত্রের ভাই বিপ্লব কাল সকালে তোমার বাড়ি যাবে। ওর সঙ্গে গিয়ে একটা ফ্ল্যাট দেখে এসো। আমি কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিলেন। পরদিন সকালে বিপ্লব সান্যাল গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ি এলো। স্যার বলেছেন, আপনাকে একটা ফ্ল্যাট দেখাতে। আমাকে সন্তোষপুরে একটা চারতলা বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাট দেখালো আর বললো স্যার এই ফ্ল্যাটটা আপনার জন্য পছন্দ করেছেন। আমি বললাম, ফ্ল্যাট কেনার পয়সা কোথায়? কত দাম এই ফ্ল্যাটের? বিপ্লব বললো, সেটা স্যার ঠিক করে দেবেন। একটাকা বললে একটাকা। সে দিনই বিকেল বেলায় প্রকাশক অনিলবাবু আমাদের বাড়ি এলেন। একটা পঁচিশ হাজার টাকার চেক দিয়ে বললেন, স্যার বলেছেন। পরে আপনার রয়ালটির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হবে। কিছুক্ষণ পরে স্যার ফোন করে বললেন, ফ্ল্যাটটা পছন্দ হয়ে থাকলে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটটা বুক করো। মাস ছয়েক পরে আমরা এই ফ্ল্যাটে চলে গেলাম।
- তোর সবই খুব তাড়াতাড়ি হয়। আমার এই আই আই টির চাকরি পেতে একদিন ক্লাসে গিয়ে পড়াতে হয়েছে আর তিনবার ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিলো।
- তোর চাকরি কবে পার্মানেন্ট হলো?
- আরে সে কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি কলেজে ঢোকার কয়েক মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন বের হলো। ইন্টারভিউ খুব ভালো দিলাম। চাকরি পাকা হয়ে গেলো। কলেজের পড়ানো ধাতস্থ হয়ে গেল, ফ্ল্যাট হলো একদিন স্যারকে বললাম পি এইচ ডি করবো। স্যার বললেন বেশ ভালো কথা। একটা কম্পুটার কিনে নাও ইন্টারনেটের কানেকশান শুদ্ধ। তোমার কাজের সুবিধা হবে। আমি স্বপনকে বলে দিচ্ছি। তিনমাসে ওকে টাকা দিলেই চলবে। ওর একটা ছেলে তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে আসবে।
- তুই তো এখন ভালো কম্পুটার জানিস।
- কি আর করবো? ঠেলায় পড়ে শিখতে হলো। প্রত্যেক বছরই বেশ কয়েকজন ছাত্রী থাকে যারা খুব ভালো কম্পুটার জানে। আটকে গেলে ওদের দ্বারস্থ হই। মোটামুটি গুছিয়ে বসেছি, কলেজটা ঠিকমতো চলছে, হঠাৎ মা দু-দিন আই সি ইউ তে থেকে চলে গেলেন। আমি একদম একা হয়ে গেলাম। চারিদিকে বিরাট শূন্যতা। অনেকক্ষণ কথা বললাম। তোর অনেক বিল উঠে যাচ্ছে।
- দিদিভাই, আই আই টির অধ্যাপকরা অনেক টাকা মাইনে পায়। এক-দু ঘণ্টা কথা বললে কিছু আসে যায় না। তোর সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগছে। ছোটবেলায় একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে কানপুর কতো আর দূর। বছরে ক-দিন দেখা হয় বলতো? সমরদার কথা বল।
- সমরের আসার দিন পন্ডিতজীর গাড়ি ভাড়া করে দমদম গেলাম। ভাবছিলাম চিনতে পারবো তো। দূর থেকে দেখলাম ট্রলি ঠেলে আসছে। সামান্য একটু মোটা হয়েছে। মাথার চুল একটু পাতলা। খুব বেশি বদলে যায় নি। আমাকে দেখে দূর থেকে হাত তুললো। মাঝরাত পেরিয়ে

যাওয়ার পর বাড়ি পৌঁছলাম। বহু কষ্টে সমরের সুটকেস দুটো আমরা তিনজনে মিলে তিনতলায় তুললাম। আমি বললাম এতো ভারি কেন? ইট ভরে এনেছো নাকি? সমর হাসলো উত্তর দিলো না। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সোফায় বসে গা এলিয়ে দিলো। এক গ্লাস জল খেলো। একটা সুটকেস সোফার সামনের টেবিলটায় তুলে কম্বিনেশন লক খুলে ফেললো।

- কটা ইট ছিল তার মধ্যে?

- একটা বুককেস বার করে সেটা বাইরের ঘরের ক্যাবিনেটের উপর বসালো। তার মধ্যে ছটা বই রাখলো। দেখলাম সবকটা সমরের লেখা। সমর বললো আমার বই দেখেছো? আমি বললাম দেখেছি। কিন্তু পড়িনি। ভেবেছিলাম লেখক যদি কখনও নিজের হাতে করে দেয় তাহলে পড়বো। একটা বই আমার হাতে দিয়ে বললো সাতাশি পাতাটা খুলে দেখো।

- কি ছিলো সাতাশি পাতায়?

- সাতাশি পাতা খুলে দেখলাম আমার থিসিসের কাজের কথা লেখা আছে। প্রায় পাঁচ পাতা জুড়ে। আমি অবাক হয়ে সমরকে বললাম তুমি এটা কোথায় পেলে? স্যার বলেছিলেন, কিন্তু আমার আর পাবলিশ করা হয়ে উঠেনি। সমর বললো আমি একবার ফ্লোরিডা গিয়েছিলাম ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে। একটা শুক্রবার প্রফেসর উইলসন বললেন তোমাদের দেশের একটা থিসিস এসেছে। খুব ভালো লিখেছে। পড়বে নাকি? আমি রাতে খেয়েদেয়ে একমগ কফি নিয়ে প্যাকেটটা খুললাম। মলাটে তোমার নাম দেখলাম। প্রিফেস পড়ে বুঝলাম তুমিই। থিসিসটা যখন পড়া শেষ হলো তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শেষ পাতায় ভাঁজ করা দুটো কাগজ ছিল। প্রফেসর উইলসনের রিপোর্ট। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সোমবার যখন থিসিসটা ফেরত দিতে গেলাম তখন প্রফেসর উইলসন বললেন এই থিসিসটা আমেরিকার যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। আমি প্রফেসর উইলসন কে বললাম এই থিসিসের কিছু অংশ আমি ভবিষ্যতে আমার একটা বইতে ব্যবহার করবো। প্রফেসর উইলসন বললেন তাহলে থিসিসটা তুমি রেখে দিতে পারো। আমি সমরকে বললাম স্যার তোমাকে কি রেকো দিয়েছেন জানো? সমর বললো না।

- তুই কি করে জানলি?

- স্যার অবসর নেবার আগে আমাকে ওনার ঘরের কাগজপত্র ঝাড়াই বাছাই করার জন্য ডেকেছিলেন। আমি গরমের ছুটির মধ্যে সাতদিন সেই কাজ করেছিলাম। কাগজপত্রের মধ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা হলদে ফাইল পেলাম যার উপর মোটা কলমে "R" লেখা ছিলো। আমি স্যারকে বললাম এটা কি করবো? স্যার বললেন ফাইলটা খোলো, মাঝামাঝি জায়গায় একটা নীল কাগজ আছে সেটা পড়ে দেখো। সেটা দু-পাতা জুড়ে সমর বোসের রেকো। তার শেষ প্যারাটা সত্যিই পড়ার মতো - আমি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত আছি। প্রত্যেক বছর দুই একজন ভালো ছেলেমেয়ের শিক্ষক হবার সৌভাগ্য আমার হয়ে থাকে। আজ আমি পিছনে ফিরে তাকালে নিঃসন্দেহে বলতে পারি সমর বোস এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সমাজ বিজ্ঞানী হিসাবে দেশে বিদেশে আমার কিঞ্চিৎ পরিচিতি আছে। একথা

নির্দ্বিধায় বলা যায় যে দীর্ঘ চল্লিশ বছরে আমি যে জায়গায় পৌঁছেছি সমর অতি অল্প দিনের মধ্যে সে জায়গায় পৌঁছে আমাকে অতিক্রম করে চলে যাবে। হি ইজ বেটার দ্যান মি।

- সমরদা কি বললো?

- স্যার আমাকে খুব স্নেহ করেন। না হলে এইরকম রেকো কেউ দেয়।

- তুই কি তোর থিসিসের রিপোর্ট দেখিসনি?

- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যান্ডিডেটকে রিপোর্ট দেখতে দেয় না। স্যার শুধু বলেছিলেন রিপোর্ট ভালো।

- সুটকেস থেকে আর কটা ইট বের হলো?

- আর বলিস না। প্রচুর খাবার জিনিষ, কসমেটিকস্, ক্রকারি, চকলেট, কফি, কফি তৈরির যন্ত্র আরো কত কি। দুটো সুটকেসের সব জিনিষই আমার জন্য। সমর শুধু নিজের জন্য কয়েকটা শার্ট, প্যান্ট এনেছে। তারপর হাতব্যাগটা খুললো। একটা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে আমার একটা ছবি তুলে বললো দেখো ক্যামেরাটা পছন্দ হয় কি না? অবাক হওয়া আরও বাকি ছিলো। একটা ল্যাপটপ তোমার জন্য আনলাম। এ-কদিন আমি ব্যবহার করবো। তারপর এটা তোমার। সত্যি কথা বলতে কি এবার আমি লজ্জা পেলাম। পাগলের মতো এতো টাকা খরচ করেছে। সমরকে বললাম অনেক রাত হয়েছে। নতুন পাঞ্জাবি পায়জামা ঘরে আছে। খেয়েদেয়ে আজকে ঘুমিয়ে পড়ো।

- কোথায় কোথায় বেড়ালি?

- গাড়ি ভাড়া করে চরকির মতো শহর চষে ফেললাম। কলকাতায় এতো দেখবার জিনিষ আছে জানতাম না। কয়েকটা থিয়েটার দেখলাম, অ্যাকাডেমিতে দুটো ছবির এক্সিবিশান বেশ ভালো লাগলো। দুটো ক্লাসিক্যাল মিউজিক আর একটা রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান শুনলাম। ইডেনে ইন্ডিয়া - সাউথ আফ্রিকা একদিনের খেলা দেখলাম। এ সব আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো। শান্তিনিকেতনে চার দিন কাটিয়ে এলাম। কি আশ্চর্য্য! তিরিশটা দিন হুস করে কেটে গেলো।

- সমরদা যাওয়ার সময় কি বললো?

- বছরের শেষ দিন সমরকে নিয়ে সন্ধ্যায় দমদম গেলাম। সারা রাস্তা সমর প্রায় চুপ করে বসেছিলো। আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। সমর ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে এয়ারপোর্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমার হাত দুটো ধরে বললো পাসপোর্টটা করে রেখো। আমি গরমকালে আবার আসব।

March 2011